হৃদয়ের রসায়ন

হৃদয়ের রসায়ন

আমিনা তাবাস্‌সুম

অধ্যয়ন

একমাত্র পরিবেশক তাম্রলিপি

হৃদয়ের রসায়ন
আমিনা তাবাস্‌সুম

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

অধ্যয়ন : .....

প্রকাশক
তাসনোভা আদিবা সেঁজুতি
অধ্যয়ন প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রচ্ছদ
মোঃ সাদিতউজজামান

বর্ণ বিন্যাস
অধ্যয়ন কম্পিউটার

মুদ্রণ
মা প্রিন্টিং প্রেস
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন, ঢাকা।

মূল্য : ৫০০.০০

Hridoyer Rasayan
By : Ameena Tabassum
First Published : February 2023, by Tasnova Adiba Shanjute
Addhayan Prokashoni, 38/4, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price: 500.00 $: 10

ISBN : 978-984-95982-5-1

উৎসর্গ

আমার প্রিয় পুত্র এবং কন্যা
যাইদ এবং যায়নাব

লেখকের কথা

ভিন্ন প্রজন্মের এবং ভিন্ন পরিবেশে বেড়ে ওঠা একজন মা এবং তার মেয়ের চিন্তাধারার মধ্যে তারতম্য থাকতেই পারে। সেটা অনেকসময় প্রকটভাবে চোখে পড়ে মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র নির্বাচনের সময়। একজন মেয়ের জীবনসঙ্গী নির্বাচনের মাপকাঠি কী হওয়া উচিত? মায়ের কাছে সেই মাপকাঠি হয়তোবা এক আর মেয়ের কাছে আরেক।

দীর্ঘ প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি যে বিদেশে বড় হওয়া বাংলাদেশি মেয়েদের পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে নানান প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, চিন্তাধারা, পরিবার এবং সমাজের প্রত্যাশা সবকিছু মিলিয়ে তাদের রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। তার ওপর যদি অপ্রত্যাশিত প্রেম, ভালোবাসা এইসব ভর করে বসে তাহলে তো ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায়।

এই বিষয়টি মাথায় রেখে আমি "হৃদয়ের রসায়ন" উপন্যাসটি লেখা শুরু করি। লিখতে গিয়ে অন্যান্য বিষয় যুক্ত হতে থাকে। পারিপার্শ্বিকতা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার চাপে পড়ে অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের মধ্যে আজকাল সৌন্দর্য সচেতনতা অনেক বেড়ে গেছে। এর ভালো দিক যেমন আছে, খারাপ দিকও আছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরা অবাস্তব সৌন্দর্যের পিছে ছুটতে গিয়ে অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরা শারীরিক এবং মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বেড়ে যাচ্ছে ইটিং ডিজঅর্ডারের মতো মানসিক অসুস্থতার প্রকোপ।

এই সবকিছু মিলিয়ে করোনা অতিমারীর সময় যুক্তরাজ্যে বসবাসরত একটা সাধারণ বাংলাদেশি পরিবারের গল্প আমার এই হৃদয়ের রসায়ন উপন্যাস।

আশাকরি এই উপন্যাসটি পাঠকদের শুধু একটা গল্প উপহারই দেবে না, সাথে চিন্তারও খোরাক জোগাবে।

আমিনা তাবাস্‌সুম
সারে, ইংল্যান্ড

১

বেশ আধুনিক এবং শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও সুমির নিজের বিয়ের ব্যাপারে নিজস্ব মতামত দেবার সুযোগ ছিল না। সুযোগ ছিল না বললে আসলে ভুল হবে। ওর ঠিকই আবেদকে দেখার সুযোগ হয়েছিল, কথাও বলেছিল ওরা। কিন্তু আজকাল সুমির মনে হয় ওসব ছিল এক ধরনের লৌকিকতা বা ভড়ং। যেহেতু সুমির কারো সাথে প্রেম ছিল না, পরিবারের সবার পছন্দমতো ওকে যখন আদর্শ পাত্র দেখানো হয়েছে, তখন একজন আদর্শ মেয়ে হিসেবে "হ্যাঁ" বলাই ওর একমাত্র অপশন ছিল। "না" বলার মতো অযৌক্তিক কাজ করার সাহস কি ওর আদৌ ছিল?

শুধু সুমি কেন, সুমিদের সময় বেশির ভাগ মেয়েই মনে হয় বিনা বাক্য ব্যয়ে পরিবারের পছন্দমতো আদর্শ পাত্রদের গলায় মালা পরিয়েছে। যে মেয়েরা প্রেম করত বা যারা একটু বিদ্রোহী টাইপের ছিল তারা ছাড়া। আজকাল সুমির জানতে ইচ্ছা করে, তাদের সবাই কি বিয়েতে রাজি হওয়ামাত্রই সেই পাত্রের প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া শুরু করে দিয়েছিল?

সুমির যখন বারো বছর বয়স, ওদের পাশের বাসায় থাকত স্বর্ণা আপা। স্বর্ণা আপা তখন এইচএসসি পাস করে কেবল ইডেন কলেজে অনার্সে ভর্তি হয়েছে। কিশোরী সুমির কাছে সেই স্বর্ণা আপা ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। শুধু সুন্দরীই না, ভীষণ গুণী আর ভারি মিষ্টি ব্যবহার ছিল স্বর্ণা আপার। অনার্স শুরু করামাত্র সেই স্বর্ণা আপার বিয়ে হয়ে যায়। বাবা-মায়ের মুখে সুমি শুনেছে স্বর্ণা আপা কত ভাগ্যবতী। বিশাল ধনী পরিবারের, শিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত ছেলের সাথে বিয়ে হয়েছে তার। কিন্তু বিয়ের সময় বরকে দেখে সুমির তো রীতিমতো কান্না চলে এসেছিল। এ কেমন বর আবার? একটু বয়স্ক, গোঁফওয়ালা, ভুঁড়িওয়ালা সেই বরকে স্বর্ণা আপার পাশে বড্ড বেমানান ঠেকছিল বারো বছরের সুমির। এই কথা সুমি ওর মাকে বলতেই মা হেসে দিয়েছিল। হেসে সুমিকে আবার একটা ছড়াও শুনিয়েছিল,

রূপের সাথে নাহি চলে গুণের তুলনা
রূপেতে আঁখি ভুলে, গুণেতে হৃদয় গলে
তাই বলি রূপে গুণে তুলনাই চলে না

ছোট্ট সুমি মায়ের সেই ছড়ার মর্ম সেই সময় ঠিক অনুধাবন করতে পারেনি। কিন্তু এত বছর পর আজকাল ওর খুব জানতে ইচ্ছা করে, সেই লোককে বিয়ে করে কি স্বর্ণা আপা সুখী হতে পেরেছে?

চায়ের মগে টি ব্যাগ রেখে ইলেকট্রিক কেটলিতে পানি গরম করতে দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর প্রেম ভালোবাসার ভাবনায় বুঁদ হয়ে ছিল সুমি। হঠাৎ করে ইলেক্ট্রিক কেতলির ধাতব শব্দে ওর সম্বিৎ ফিরল। আজকাল অকারণে বড্ড উদাস হয়ে যাচ্ছে সুমি। এসব নিয়ে ওর এত ভাবনা কেন? ও তো আবেদের সাথে সুখে শান্তিতেই সংসার করছে।

ভালো-মন্দ মিলিয়েই তো মানুষ। তারপরও সুমির মনে হয় সেই আদর্শ পাত্র আবেদ শুধু পাত্র হিসেবে না, স্বামী হিসেবেও একেবারে আদর্শ। স্ত্রী অন্তঃপ্রাণ যাকে বলে। বাবা হিসেবেও সে চমৎকার। আর সুমি? সুমিকে ঠিক স্বামী অন্তঃপ্রাণ বলা যাবে না কিন্তু তারপরও ওর মনে হয় ও আবেদকে ভালোই বেসেছে।

আসলেই কি সুমি আবেদকে ভালোবেসেছে? তাহলে এই দীর্ঘ ২৪ বছর সংসারের পর, আজকাল সুমির বুকটা কেন কেঁপে উঠছে? বারবার কেন ওর নিজের মনেই নানান প্রশ্ন জাগছে? নিজেকে কেন মাঝে মাঝে ভীষণ দুঃখী মনে হয়? কেন মনে হয় ও আবেদকে ঠকিয়েছে? কেন হঠাৎ হঠাৎ ইচ্ছা করে সব বন্ধন ছিন্ন করে নিজেকে মুক্ত করে নিতে? কেন শখ জাগে জীবনটাকে একটু ভিন্নভাবে দেখতে বা উপভোগ করতে?

এই ভাবনা মাথায় আসতেই সুমি সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে তাড়াতাড়ি চা বানানোয় মন দিল। কী ওলটপালট চিন্তা করছে ও? সুমির মনে হলো ওর এই অলক্ষুনে ভাবনার জন্য দায়ী ওর বড় মেয়ে নাবিলা। নাবিলাকে নিয়ে সুমি আপাতত ভীষণ অশান্তিতে আছে।

নাবিলার বয়স এখন তেইশ বছর। ওর তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে এই বড় মেয়ে নাবিলাই সবচেয়ে নরম প্রকৃতির। শুধু নিজের মেয়ে বলে না, সুমির ধারণা নাবিলার মতো লক্ষ্মী মেয়ে পৃথিবীতে কমই আছে। সেই ছোট্টবেলা থেকে আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র, পড়াশোনা, গান, ছবি আঁকা, রান্না, বেকিং সব কিছুতেই নাবিলা যেন একেবারে শ্রেষ্ঠ। শুধু তাই না, কোনোদিন সুমির কোনো কথার অবাধ্য হয়নি সে। যা বলেছে একেবারে লক্ষ্মী মেয়ের মতো চুপচাপ করে গেছে। কোনোদিন কোনো কিছুতে "না" ছিল না ওর। সে কারণে আল্লাহ ওর সব সময় ভালোও করেছে। যা কিছুতে ও হাত দিয়েছে সবকিছুতে যেন সাফল্য কুড়িয়ে নিয়েছে। ইংল্যান্ডে বড় হওয়া মেয়ে কিন্তু বাবা-মায়ের এত বাধ্য, এত লক্ষ্মী যে সবাই নাবিলাকে দেখে প্রশংসা না করে পারে না। কিন্তু হঠাৎ করে যে মেয়েটার কী হলো সুমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

দুই বছর আগে নাবিলা ইংল্যান্ডের নামকরা এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে অনার্স করে লন্ডনে এখন ভালো একটা চাকরি করছে। সুমি আর আবেদ দুজনেই ছেলেমেয়েদের মানুষ করার ব্যাপারে সব সময়ই বেশ যত্নশীল। তাই তিন ছেলেমেয়ের কেউই মাশাআল্লাহ খারাপ করছে না। সারা জীবন নিজে চাকরি করে গেলেও, সুমি ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে কখনো কোনো আপস করেনি। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, খাওয়া দাওয়া, চাহিদা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ, ধর্মশিক্ষা সবকিছুর ওপর ছিল ওর কড়া নজরদারি। কোনো ব্যাপারে একটু এদিক-ওদিক হবার কোনো অবকাশ রাখেনি।

ওদের মেজো ছেলে নাহিন নাবিলার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট, এই তো আঠারোয় পা দিল। এই সেপ্টেম্বরে ওর ইউনিভার্সিটি শুরু হতে যাচ্ছে। আপাতত মহামারী কোভিডের কারণে সারা বিশ্ব লকডাউনে থাকায় নাহিনের নতুন বিশ্ববিদ্যালয় শুরুর উৎসাহ-উদ্দীপনায় যেন একটু ভাটা পড়েছে। ছেলেটা নাবিলার মতো অত লক্ষ্মী আর শান্তশিষ্ট না। একটু দুরন্ত গোছের কিন্তু ভীষণ মেধাবী আর মনটা ওর বিশাল, অন্তত সুমির মনে হয়। তাছাড়া নাহিন ভীষণ মা ন্যাওটা ছেলে। এই কারণে সুমির ছেলের প্রতি একটা বিশেষ দুর্বলতা আছে।

আর ছোট মেয়ে নায়লার বয়স চৌদ্দ। সে হচ্ছে বাসার বিদ্রোহী রমণী। সবচেয়ে ছোট দেখে বাবা আর বড় দুই ভাই বোনের আদর পেয়ে একেবারে মাথায় উঠে গেছে। পৃথিবীর কাওকে সে তোয়াক্কা করে না। আর মা তো কোথাকার কোন ছাড়। দুইটা ছেলেমেয়ে তরতর করে কীভাবে বড় হয়ে গেল সুমি টেরই পায়নি। কিন্তু এই ছোটটা সুমিকে একেবারে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরাচ্ছে। সুমি যা করতে বলে তা নিয়েই তার সমস্যা। এটা কেন করতে হবে, এভাবে কেন করতে হবে, ওভাবে কেন করা যাবে না, না করলে কী হবে, এর কোনো প্রয়োজন নেই– এই ধরনের প্রশ্ন করে করে সুমির জীবনটাকে একেবারে ঝালাপালা করে ফেলে। আর এই ছোটটাকে বেশি শাসনও করা যায় না। একটু কিছু বললে বাবা আর ভাই বোন মিলে একেবারে সুমির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের কথা, আহারে ছোট মানুষ তো। আরে, ছোট মানুষ তো বাকি দুইটাও ছিল। কোথায়, তাদের তো কোনো কিছুতে এত খবরদারি সুমি কখনো দেখেনি? আর ওদের বাবা তো বড় দুইটাকে কড়া শাসনের মধ্যে সব সময় রেখেছে। দুইটা কি খারাপ হয়েছে? এখন ছোটটাকে এত আহ্লাদি দিয়ে নষ্ট করার কোনো মানে আছে?

তবে সুমির মনে হয় ওর তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে নায়লাটা সবচেয়ে বুদ্ধিমতী আর সাহসী। শুধু তাই না, সুমির কোনো কঠিন কাজ করতে হলে বা কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে ছোট্ট নায়লাই সুমিকে সাহস দান করে থাকে। আর ছোট হলে কী হবে, পরামর্শদাতা হিসেবেও সে খুব ভালো। কোনো কিছু নিয়ে অশান্তি বা দোটানায় থাকলে সুমি নিজের অজান্তেই নায়লার সাথে মন খুলে আলোচনা করে। আর নায়লা গম্ভীর হয়ে সুমিকে নানান পরামর্শ দেয়। নায়লার ধারণা সুমি ভীষণ নরম প্রকৃতির মানুষ। সাহস করে কিছু বলে উঠতে পারে না কিন্তু মনে মনে কষ্ট পেয়ে বসে থাকে। তাই এই ব্যাপারে সে সুমিকে সব সময় নানা পরামর্শ দান করে থাকে।

"মা, এরকম করে জীবন চলে না।

মা, সব সময় এত ভালো সেজে থাকো কেন?

একটু স্ট্রং হও। তা না হলে সারা জীবন ধরে আফসোস আর প্যানপ্যান করতে হবে।"

সুমি আর নায়লাকে কী শাসন করবে, নায়লাই পারলে সুমিকে শাসনের ওপর রাখে। নায়লাকে নিয়ে সুমির দুশ্চিন্তার শেষ নেই।

কিন্তু এই মুহূর্তে যাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে সে হলো নাবিলা। দুশ্চিন্তার কারণ হলো নাবিলা বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না। এই ইংল্যান্ডে বড় হওয়া বাংলাদেশি মেয়েদের বিয়ে নিয়ে অনেক ঝামেলা। বিশেষ করে লক্ষ্মী মেয়েদের। এদেরকে বাবা-মায়েরা ভীষণ রক্ষণশীলভাবে কড়া নজরে বড় করে। তাই নিজেদের কারো সাথে প্রেম ভালোবাসা করার সুযোগ হয় না অথবা সাহস হয় না। আবার তাদের কিছুটা স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে বাবা-মায়ের পছন্দ করা ছেলেদেরও সহজে মেনে নিতে পারে না। ফলে এ ধরনের মেয়েদের বিয়ে দেওয়া একটা জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। নাবিলা পড়াশোনা শেষ করেছে, ভালো চাকরি করছে, সুমির মনে হয় এখনই নাবিলার বিয়ে দিয়ে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বেশিদিন স্বাবলম্বী হয়ে নিজের মতো থেকে অভ্যস্ত হয়ে গেলে ছেলে জোগাড় করা আরো মুশকিল হয়ে যাবে।

সুমির ধারণা ছিল যে ও একটা ভালো ছেলে পছন্দ করে দিলে নাবিলা সুড়সুড় করে বিয়ে করে ফেলবে। জীবনে তো কোনোদিন সে মায়ের কথার অবাধ্য হয়নি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা মোটেও সে রকম কিছু না। এত ভালো ভালো প্রস্তাব আসছে। এদেশে বড় হওয়া, শিক্ষিত, ভালো চাকরি

করে, ভালো পরিবারের সব ছেলেরা কিন্তু নাবিলার দেখি কাউকে ভালো লাগে না। কয়েকদিন আগে এত ভালো একটা প্রস্তাব এল যে বলার না। ছেলেটা শুধু ভালো চাকরিই করে না, পরিবারটাও সুমিদের মতো। আর ছেলেটা এত সুন্দর দেখতে, এত মার্জিত ব্যবহার যে সুমি তো দেখে একেবারে মুগ্ধ। নাবিলা আর ছেলেটা একদিন একটা রেস্টুরেন্টে দুজনে দেখাও করে এল। ছেলেটার নাবিলাকে খুবই পছন্দ হয়েছে নাকি। কিন্তু নাবিলার সেই একই ঢং, ওর নাকি ভালো লাগেনি। কী ভালো লাগেনি, কেন ভালো লাগেনি কিছুই সুমি বের করতে পারেনি। শুধু ভালো লাগেনি, এটাই তার শেষ কথা।

তারপর নায়লার কাছ থেকে সুমি বের করতে পেরেছে যে নাবিলা নাকি ছেলেটার সাথে কোনো কেমিস্ট্রি ফিল করেনি।

আরে ওরা কি কোনো রাসায়নিক পদার্থ যে দেখামাত্রই কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন শুরু হয়ে যাবে? এসব আবার কী ঢঙের কথা? নায়লা অবশ্য বলেছে,

মা, তুমি বাইরে ভাব করো যে তুমি একটা প্রোগ্রেসিভ মহিলা কিন্তু ভেতরে ভেতরে তুমি একেবারে সেকেলে। কিচ্ছু বুঝো না। একটা মিনিমাম কেমিস্ট্রি তো থাকতে হবে?

সুমির ওর চৌদ্দ বছরের মেয়ের সাথে এই ব্যাপারে তর্ক করতে ইচ্ছা হয়নি। আর নায়লাটা যে কী জোগাড় করে বিয়ে করবে সেটা চিন্তা করতেও ভয় লাগে সুমির। কিন্তু নাবিলার কাছ থেকে এ রকম আচরণ কখনোই আশা করেনি ও। কেমিস্ট্রি তো ধীরে ধীরে হয় আর যদি নাই হয় তাতেই বা কী? এটা তো কারো জীবনসঙ্গী নির্বাচনের মাপকাঠি হতে পারে না।

সুমির যখন বিয়ে হয়েছিল তখন ওর বিশ বছর বয়স। ইউনিভার্সিটির পড়াশোনাও শেষ করেনি। আবেদকে দেখেও একটুও আকৃষ্ট হয়নি। সুমির পক্ষ থেকে দেয়ার ওয়াজ নো কেমিস্ট্রি হোয়াট সো এভার। কিন্তু আবেদের সুমিকে অনেক ভালো লেগেছিল। পরিবারের সবার পছন্দ দেখে সুমি কিছু বলে ওঠার সাহস পায়নি। আর কীই বা বলত সুমি? আবেদ তো সবদিক থেকে একেবারে আদর্শ পাত্র ছিল। তারপর সেই একপক্ষের আকর্ষণের ওপর ভিত্তি করে সুমির বিয়ে আর এই এত বছরের সংসার। নাহ, ধীরে ধীরে আবেদের প্রতি সুমির সেই কেমিস্ট্রির জন্ম নেয়নি। তবে সুমির প্রতি আবেদের আকর্ষণ আর আগ্রহের কখনোই কোনো কমতি ছিল না আর এত

বছর পার হয়ে যাবার পরও কোনো কমতি নেই। আর সুমি সেই উত্তেজনাহীন, আকর্ষণহীন, কেমিস্ট্রিবিহীন শারীরিক সম্পর্ক নিত্য বজায় রেখে চব্বিশ বছর সংসার করে গেল, তিন সন্তানের মা হয়ে গেল।

এতে কি সুমির কোনো দুঃখ আছে? আক্ষেপ আছে? না তো। শুধু আজকাল নাবিলার এই আচরণে একটু ওলটপালট চিন্তা মাথায় আসছে। সুমি তো এতদিন ভালোই ছিল। এখনো ভালোই আছে। শরীরের আনন্দের চেয়ে জীবনে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে। সুমির কাছে ওর আর আবেদের সম্পর্ক শরীরের আকর্ষণে বাধা না। এই সম্পর্ক সম্মান, ভালোবাসা, বিশ্বাসের তারে বাধা। এই বন্ধন কোনো কেমিস্ট্রির বন্ধনের থেকে অনেক জোরালো। রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে যাবার পর সব শেষ হয়ে যাবার মতো ব্যাপার না। এই সাধারণ ব্যাপারটা নাবিলাকে কে বোঝায়?

২

নাবিলা অফিসের কাজ শেষ করে ল্যাপটপটা বন্ধ করেই বিছানায় শুয়ে পড়ল। ও ঘরে বসেই টের পাচ্ছে যে ওর মা ইতিমধ্যে নিচের তলার রান্না ঘরে গিয়ে সবার জন্য রাতের খাবার তৈরি করা শুরু করে দিয়েছে। এই করোনার কারণে বেশ কিছুদিন ধরে নাবিলা আর ওর মা দুজনেই বাসা থেকে অফিসের কাজ করছে। নাবিলার বাবাও মাঝে মাঝে বাসা থেকে কাজ করে। কিন্তু ওর বাবা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার তো, তাই সাইট ভিজিট থাকার কারণে প্রায় দিনই বাইরে যেতে হয়। নাবিলার ভাই নাহিনের তো মহাফুর্তি। ওর এ-লেভেল পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। সে আপাতত গায়ে হাওয়া বাতাস লাগিয়ে মহাআনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সারাদিন শরীরচর্চা করে বডিবিল্ডারদের মতো স্বাস্থ্য বানানোর চেষ্টা করছে।

ওর স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হচ্ছে কিনা তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু সকাল বিকাল নাবিলাকে এসে মহাউৎসাহে ওর মাসল দেখিয়ে যাচ্ছে। আর ছোট বোন নায়লা বাসা থেকেই অনলাইনে স্কুল করছে। নাবিলার মনে হচ্ছে নায়লাকে ওর স্কুল থেকে পড়াশোনার তেমন কোনো চাপ দেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু নায়লা এমন ভাব করছে যে সে মহাব্যস্ত, নিঃশ্বাস নেবার সময় পর্যন্ত ওর নেই। নায়লাকে কিছু একটা করতে বললে এমন কাজের ভাব দেখায় যে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীও এত ব্যস্ত না।

অফিসের কাজ শেষ করেই নাবিলা সাধারণত নিচে মাকে রান্নাঘরে সাহায্য করতে চলে যায়। সবাই মিলেই একসাথে সবগুলো কাজ করে ফেলে। কিন্তু এখন নাবিলার একটুও মায়ের কাছে যেতে ইচ্ছা করছে না। মা আজকাল নাবিলার বিয়ে নিয়ে অতিরিক্ত যন্ত্রণা করছে। সামনে গেলেই বিয়ে বিয়ে করে মাথাটা একেবারে খারাপ করে দেয় নাবিলার। পৃথিবীতে মনে হয় বিয়ে ছাড়া কথা বলার আর কোনো বিষয় নেই। প্রতিনিয়ত উদ্ভট সব পাত্রের খোঁজখবর নাবিলাকে জানাচ্ছে আর নাবিলাকে সেই পাত্রদের সাথে দেখা করার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে দিচ্ছে। নাবিলা মাকে কোনো ব্যাপারে না বলে অভ্যস্ত না। তাই অনেক অনিচ্ছা সত্ত্বেও সব পাত্রদের সাথে দেখা করছে, হাসি মুখে কথা বলছে, চেষ্টা করছে খোলা মনে সবার সাথে পরিচিত হতে। কাউকে হয়তোবা ভালো লেগে যেতেও পারে। কিন্তু নাবিলার ভালো না লাগলে ও কী করবে? জোর করে ভালো লাগাবে? নাকি না ভালো লাগলে ও মায়ের মন রাখতে বলতে হবে ওর পাত্র পছন্দ হয়েছে? তারপর সাথে সাথে বিয়ে করে সুখে শান্তিতে বসবাস করা শুরু করে দিতে হবে। ওর তো মনে হচ্ছে মা সেটাই চায়। ওর কোনো পছন্দ অপছন্দের কোনো প্রশ্নই নেই এখানে। মায়ের পছন্দ হলেই হয়ে গেল। নাবিলার রান্নাঘরে যেতে একটুও ইচ্ছা করছে না। কিন্তু আবার মা একা একা কাজ করছে মনে করেও একটু অস্বস্তি হচ্ছে। মেজাজ খারাপ আর অস্বস্তি নিয়ে নাবিলা গুম হয়ে বিছানায় পড়ে থাকল।

হঠাৎ নাবিলার দরজায় নক।

– আসতে পারি আপু?

নাহিনের আগমন। নিশ্চয়ই এখন ওর শরীরচর্চার বিস্তারিত অগ্রগতি জানাতে এসেছে। নাবিলার এখন নাহিনের কথা শোনার একটুও আগ্রহ নেই।

ঘরে ঢুকে এই অসময়ে নাবিলাকে শুয়ে থাকতে দেখে নাহিন যেন একটু অবাকই হলো। জিজ্ঞেস করল,

– এ সময় ঘুমাচ্ছ কেন?

– ঘুমাচ্ছি কোথায়। শুয়ে আছি।

– ওই, একই কথা।

– মোটেও এক কথা না। কী বলতে এসেছ বলো।

– তোমাকে নাকি পৃথিবীর সেরা পাত্র দেখানো হয়েছে আর তুমি নাকি তাকে বাতিল ঘোষণা করে দিয়েছ?

– এসব ফালতু কথা তোমাকে কে বলল?

– আমাকে কি কারো কিছু বলা লাগে? আমি হলাম সবজান্তা। আমি সবার চেহারা দেখলেই সব বুঝে যাই। এইমাত্র রান্নাঘরে মায়ের চেহারা দেখে এটা বুঝে আসলাম।

– আমার ঘর থেকে বের হয়ে যাও।

– আহা, রেগে যাচ্ছ কেন আপু। আমি তো তোমাকে জানাতে আসলাম যে তোমার কোনো চিন্তা নেই। আমি তোমার দলে আছি। আমি পাত্রের ছবি দেখেছি। আমারও পছন্দ হয়নি।

– বললাম না আমার সামনে থেকে চলে যাও।

– ঠিক আছে বাবা, যাচ্ছি তো। শুধু আমার পাত্র কেন পছন্দ হয়নি সেটা জানিয়েই চলে যাচ্ছি। পাত্রের শরীরচর্চার বিশেষ প্রয়োজন। আমি ছবি দেখেই বুঝে গেছি যে সে কোনোদিন জিমে যায়নি। এ রকম পাত্র আমার বোনের যোগ্য হতেই পারে না।

– এখনি বের হয়ে যাও।

– আচ্ছা বাবা যাচ্ছি, যাওয়ার আগে কি তোমাকে একটু আমার ব্যায়ামের অগ্রগতি দেখিয়ে যেতে পারব?

নাবিলার অগ্নি দৃষ্টি দেখে নাহিন আর কিছু দেখানোর আপাতত সাহস করল না। বুঝল নাবিলার কাছে এই মুহূর্তে খুব একটা সুবিধা করা যাবে না। ভাবল এর চেয়ে বরং মায়ের সাথে গল্প করা ভালো। ও নাবিলার ঘর থেকে বের হয়ে নিচের তলায় নামার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। নামার পথে কী জানি মনে করে নায়লার ঘরে নক করে ঢুকে গেল।

নায়লা ওদের তিন ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে কম স্বাস্থ্য সচেতন। মিষ্টিজাতীয় কোনো খাবার দেখলে ওর কোনো হুঁশ থাকে না। এক বাক্স চকলেট সে নির্বিকার মুখে এক বসায় খেয়ে ফেলতে পারে। এই নিয়ে সবার কাছে বকা খেতে হয় নায়লাকে প্রায়ই। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোনো দৃক্‌পাতই নেই ওর। নায়লাকে ঠিক মোটা বলা যাবে না কিন্তু ওর মধ্যে একটু মুটিমুটি একটা ভাব আছে। এই নিয়ে নাহিন ওকে খেপিয়ে অনেক আনন্দ পায় কিন্তু নায়লা সব খেপানো সহ্য করলেও ওকে মোটা বললে কিছুতেই সেটা নিতে পারে না। একেবারে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। এ কারণেই নাহিন এই ব্যাপারেই নায়লাকে খেপাতে সবচেয়ে ভালোবাসে।